যাপিত জীবন

সেলিনা হোসেন

যাপিত জীবন – সেলিনা হোসেন। রচনাকাল – ২৯ অক্টোবর ১৯৭৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯। পুনর্লিখন ১৯৮৭। পুনর্লিখন ডিসেম্বর ২০১১। উৎসর্গ – ডাক্তার চণ্ডীপদ চক্রবর্তী

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুলো ওরা

কিছু কথা

২০১২ সালে পূর্ণ হলো ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর। ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময়ের চূড়ায় পৌঁছেছে এই ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটি আমাদের সামনে অমর একুশে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আজ শুধু বাঙালির শহীদ দিবস নয়। ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লিখেছিলাম উপন্যাস যাপিত জীবন। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। রচনাকাল ছিল ২৯ অক্টোবর ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯। মোটামুটি একটি বড় সময় নিয়ে লেখার পরও মনে হয়েছিল ঠিকমতো হলো না। ১৯৮৭ সালে পুনর্লিখন করলাম।

ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হলো এই উপন্যাসটির অণুপুঙ্খ বিবরণ আরো একটু বিস্তৃত পরিসর দাবি করে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আবার লিখতে শুরু করলাম। উপন্যাসে যোগ হলো আরো একশ পৃষ্ঠারও বেশি।

এভাবেই ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসটির পেছনে লেগে থেকেছি। এসবই একটি শিল্পের জন্য লেখকের অতৃপ্তি কিনা তা অনেক ভেবেছি। উত্তর পাইনি। কারণ এর শেষ নেই।

একত্রিশ বছর আগে লেখা উপন্যাসটি বেশ কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ভালোলাগার কথা জানতে পেরেছি পাঠকের কাছ থেকে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য হয়েছে এই উপন্যাস। তারপরও আবার পরিমার্জনা কতটা যুক্তিযুক্ত তাও ভেবেছি। এরও উত্তর জানা নেই। সে জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

ভাষা আন্দোলনের ষাট বছর পূর্ণকালে এই উপন্যাসের পরিসর বাড়াতে পেরে আমি নিজে আনন্দিত। মনে হয়েছে শিল্পের জায়গা থেকে কাজটি করতে পারা অমর একুশের জীবনদায়ী ঘটনার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন।

এই উপন্যাসের পাঠককে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

সেলিনা হোসেন
২৫ ডিসেম্বর ২০১১

০১.

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুলো ওরা। নতুন দেশ। অচেনা, অজানা শহর। কখনো ভুতুড়ে একটা জায়গার মতো লাগছে—কখনো খানিকটুকু আপন, কখনো চেনা পরিবেশের মতো, যে পরিবেশকে আপন করতে হবে—বেঁচে থাকার তাগাদায়–স্বপ্নের ভূমি বানানোর প্রয়োজনে। এমন অনুভব নিয়ে ওরা পাঁচজন পরস্পরের দিকে তাকায়-ছোটবড় পাঁচজন। যাদের নিয়ে পুরো একটি পরিবার।

ওরা নিজেদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে তেমন কিছু ছিল না, সামান্য কাপড়-চোপড় ছাড়া। আর ছিল বই। অনেকগুলো আয়ুর্বেদ বিষয়ক বই। আর রবীন্দ্রনাথের

বই। যতটা নিতে পেরেছে—সবাই ভাগাভাগি করে টেনেছে। অনেক বই কিনে আনতে হয়েছে বলে সোহরাব আলি বারবার। চোখ মুছেছে। আফসানা কেঁদেছে ফেলে আসা সংসারের জন্য। তিন ছেলের বুকের ভেতর কি হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। গত মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরুনোর পর পথে পুরো পাঁচ দিন কেটেছে। মহানন্দা পেরিয়ে গরুর গাড়িতে আমনুরা। সেখান থেকে ট্রেনে ফুলবাড়িয়া এসে নেমেছে ঘন্টাখানেক আগে। অথচ রিকসায় এইটুকু পথ আসতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে আফসানা খাতুনের। এই পাঁচদিনে বোবার মতো পথের দিকে তাকিয়ে ছিল কেবল, একটা কথাও বলেনি। বারবার চোখে আঁচল চাপা দিয়েছে। সোহরাব আলি তখনই ভয় পেয়েছিল খুব যে আফসানা খাতুন অসুস্থ হয়ে না যায়। আফসানা খাতুন শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়নি। বেঁচে থাকাকে মনের জোর দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছে। পুরোটা পথ নিজেকে সামলে রেখেছে। তার দিকে তাকিয়ে পরিবারের অন্যরা খুশি থেকেছে। দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেছে।

শেষ পর্যন্ত একটি নতুন বাড়ির দরজা খুলেছে ওদের সামনে। ওরা বুঝতে পারে যে ওদের গৃহপ্রবেশ হচ্ছে। আজ আনন্দের দিন।

ঘরের এক কোনায় বইগুলো গুছিয়ে রাখে জাফর। আপাতত মেঝের ওপরে। বাবা-মায়ের হাত থেকে বইগুলো ও নিজেই নেয়। বাকি দুভাই। নিজেরাই এনে রাখে।

বাড়িতে পৌঁছুনোর পর হরেণ আর মালতী ব্যস্ত হয়ে এটা-ওটা এনে দিচ্ছে। ওরা সব আয়োজন করেই রেখেছিল। কোনো অসুবিধা হতো না। এখন মনে হচ্ছে পথের ক্লান্তি নয়, পালিয়ে আসার ধাক্কাতেই সকলের স্নায়ু বিকল। যতক্ষণ এসেছে সামনের কথা মনে ছিল না, কোথায় যাচ্ছি, কেমন হবে এমন কোনো ভাবনাও হয়নি। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা ছিল সবাই। এখন ভয়। এই অচেনা পরিবেশে আত্মস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভয় করতে লাগল। নতুন জায়গা, বন্ধু না শত্রু? বুক টিপটিপ করে সোহরাব আলির। আফসানা খাতুন চৌকির ওপর পা উঠিয়ে গুটিসুটি বসে আছে। মুখে কথা নেই। কপালের, গালের চামড়া কুঁচকে কালো হয়ে আছে। কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে। ঠোঁটজোড়া বিবর্ণ। মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। গভীর নিশ্বাস উঠে আসে বুক ফুড়ে। সোহরাব আলি ইজিচেয়ারে এলিয়ে থেকে এসব লক্ষ্য করে। আফসানা খাতুনের ওই

পরিবর্তনে তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। পরক্ষণে অস্বস্তি তাড়ায়। বুঝাতে চায় যে আফসানার বড় কিছু হবে না। হলে আগেই হতো। এখন ওকে সময় দিতে হবে। একটি গভীর কালো সুতোর ওপর দিয়ে চলে যাবে সে সময়। তারপর সুতোটি রঙিন হবে। কখনো লাল, কখনো নীল কিংবা সবুজ ও হলুদ। সেই সুতোর বুননে ফুটে উঠবে সংসারের নকশিকাঁথা।

পরম মমতায় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কেমন লাগছে গো?

আফসানা খাতুন কথা না বলে ঘাড় কাত করে। বলতে চায়, আছি একরকম। অপেক্ষা করছি কখন বলতে পারব, ভালো।

সোহরাব আলি আবার বলে, তুমি তো ঠিক আছো?

ঠিক? আফসানা খাতুন চমকে তাকায়। বিড়বিড় করে আবার বলে, ঠিক? আমার কি আর ঠিক থাকা হবে। আমার ফেলে আসা বাড়িঘর... সংসার...

আফসানা খাতুন আঁচলে মুখ ঢেকে গোঙ্গানির শব্দ করে। সোহরাব আলি দ্রুত কাছে এসে বলে, থাম নীরু থাম। ছেলে শুনতে পেলে মন খারাপ করবে।

।আফসানা খাতুন কান্না থামায়। আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। শান্ত হয়ে বসে।

মারুফ, জাফর আর দীপু কুয়োতলায় হাত-মুখ ধুতে গেছে। ওরা জোরে জোরে কথা বলছে। নতুন দেশের পানি ওদের শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে, মন ভালো করে দিচ্ছে—এসব কথা বলছে। আফসানা খাতুন কান খাড়া করে আরো কিছু শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু কথা আর ভেসে আসে না। ভেসে আসছে ওদের হাসির শব্দ। আফসানা খাতুন স্বস্তি পায়। এতক্ষণে মনে হয় তার দম ঠিক হয়ে আসছে। ওটা আর কষ্টের কাঁটাতারে আটকে যাচ্ছে না। ছেলেগুলো আনন্দে আছে এটুকু শান্তিতে আফসানা খাতুন সোজা হয়ে বসে।

মালতী একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। ঘোমটার আড়ালে ওর চেহারা তেমন দেখা যায়নি। আফসানা খাতুনের একবার মনে হয় ওকে ডেকে এখানকার খোঁজ-খবর করে, কিন্তু পরক্ষণে তেমন ইচ্ছে হয় না। ফেলে আসা বাড়িঘর বুকের ভেতর এমন জমাট হয়ে আছে যে নতুনটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার ফাঁক কৈ? বুকের ভেতর হাওয়া নেই বলে মুখে কথা সরে না। নাকি ছেলেদের হাসির শব্দ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে দেশটাকে আপন করতে হবে। এটাই এখন তার বিকাশ। যেটা ফেলে এসেছে সেটা বুকের ভেতরে থাকবে। স্বপ্নের ভেতরে ডুবে যাবে কিংবা স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগে নাক উঁচু করে বলবে, আমাদের কথা ভেবো। তোমার অতীত—তোমার রেখে যাওয়া জায়গা জমিন-গাছ-পাখি এবং মানুষ। ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের মতো থাকো, শুধু আমাকে দিও না। আফসানা খাতুন বড় করে শ্বাস ফেলে। সোহরাব আলি চমকে তার দিকে তাকায়, কিন্তু তার মনে হয় কিছুক্ষণ আগে দেখা আফসানা খাতুনের সঙ্গে এই আফসানা খাতুনের মিল নেই। নতুন দেশে এসে এই প্রথম ও অন্যরকম মানুষ হয়েছে। সোহরাব আলি খুশি হয়। মনে মনে বলে, বড় একটি বিপদ কেটে গেছে। এখন আর বিপদের কথা মনে আসবে না। হাসিমুখে বলে,

আমরা শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে আসতে পেরেছি নীরু।

আফসানা খাতুন মাথা নাড়ে। পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে নড়েচড়ে বসে, পা লম্বা করে দেয়। অনেকক্ষণ পর আফসানা খাতুন কিছুটা সহজ হবার চেষ্টা করে। হাসিমুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, এতক্ষণে মনে হচ্ছে কেউ আর আমাদেরকে ছুরি আর রাম-দা ধরে তাড়া করছে না। আমরা পালাচ্ছি না। আমাদের আশ্রয় জুটেছে।

ঠিক বলেছো। সোহরাব আলি চৌকির উপরে আফসানা খাতুনের পাশে এসে বসে। হাত ধরে বলে,

দীপেনের জন্যই সব হলো। ও যদি আমাদের বহরমপুরের বাড়িটার সঙ্গে এ বাড়িটা বদল করে না দিতে পারতো কি যে হতো?

এসব কথা এখন থাক। একটু বিশ্রাম নাও।

বহরমপুরের বাড়িটা আমার খুব প্রিয় ছিল। গাছ-গাছালি ভরা অমন বাড়ি হয় না। কত যত্ন করে গাছ লাগিয়েছিলাম। তুমি আমি মিলে গাছগুলো কত যত্নে বড় করেছিলাম। আমাদের বাড়িতে এমন অনেক গাছ ছিল যে গাছ গায়ের অন্য কারো বাড়িতে ছিল না। লোকে পথ দিয়ে যাবার সময় আমাদের বাড়ির ফুল গাছের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে যেত। বল তত্তা, ইস কি সুন্দর! তুমি আর আমি বাগানে বলে কতদিন এমন উচ্ছ্বাসের কথা শুনেছি। তাই না নীরু?

আফসানা খাতুন কথা বলে না। এমন কথার উত্তরে কথা বলতে তার ভালো লাগে না। এসব ফেলে আসা দিনের কথা দিয়ে কি এখনকার দিনগুলো ভরিয়ে রাখা যাবে? মানুষটা ওকে এভাবে গল্প শোনাবে। পুরনো দিনের গল্প এবং গল্প বলে দুঃখে-কষ্টে ক্লান্ত হয়ে যাবে। এই কথা ভেবে আফসানা খাতুনের মন খারাপ হয়ে যায়। সোহরাব আলি আবার কিছু একটা কথা বললে চুপ করেই থাকে ও। তখন শুনতে পায় স্বামীর কণ্ঠে ক্লান্তি। সোহরাব আলির কণ্ঠে ক্লান্তি।

তুমি চুপ হয়ে গেলে কেন নীরু?

কিছু ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে আরেকজনের সংসারে এসে ঠাই নিয়েছি। ওরা সব আসবাবপত্র হাঁড়িকুড়ি থালাবাসন রেখে গিয়েছে বলে আমরা আরেকটা খরচের ধাক্কা সামলাতে পেরেছি। তারপরও অন্যের সংসারের জিনিসপত্র এ কথা ভুলি কি করে!

থাক আর ভাবতে হবে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া। ভালো একটা ঘুম হলে শরীর ঝরঝরে লাগবে।

আফসানা খাতুন কিছু বলার আগেই হরেণ এসে দাঁড়ায়।

মা খাবেন এখন?

কি বেঁধেছে মালতী?

আমরা গরিব মানুষ, কি আর রাঁধবো মা? সরষে ইলিশ করেছি, চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ, পুদিনার চাটনি, ডাল। এই দিয়ে হবে তো খাওয়া?

কি যে বলো এত খাবো কি করে? মনে হচ্ছে তুমি আমাদের দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। আমরা যে তোমার দেশে এসে পড়েছি। তাই না?

লজ্জা দিচ্ছেন কেন মা? আপনারা কতদূর থেকে এলেন, আমার ক্ষমতা থাকলে কত কি যে রাঁধতাম। আর এটা তো এখন আপনাদের দেশ। শুধু আমার দেশ তো নয় মা। আপনারা ঠাই দিলে আমরাও ভালো থাকব মা।

অকস্মাৎ হরেণের কন্ঠ ভারী হয়ে যায়। চোখে জল আসতে চায়। ঢোক। গিলে সে জল ঠেকায়।

আফসানা খাতুন হরেণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় একজন খুব কাছের মানুষ পাওয়া গেলো যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যাবে। ওর একধরনের দুঃখ আছে। আফসানা খাতুন খুব দ্রুত ওর মনের কথা বুঝে যায়। দেশভাগ হওয়ার পর থেকে ভারতের মাটিতে মুসলমান হওয়ার জন্য ওরা তাড়া খেয়েছে। ওরা এ দেশে এখন শরণার্থী। আর এ দেশে হরেণ-মালতীরা তাড়া খেয়ে পালায়নি ঠিকই, কিন্তু শরণার্থী হয়ে গেছে। এই সত্য কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আফসানা খাতুন দেখতে পায় হরেণ নিজেকে সামলে গিয়েছে। ওর ঠোঁটে চিকন হাসির রেখা উঁকি দেয় আর মিলিয়ে যায়।

অল্পক্ষণে দাঁত বের করা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলে, দাদাবাবুদের খিদে পেয়েছে মা। মালতী ওদের খেতে দিয়েছে।

তুমি যাও। আমি আসছি।

হরেণ চলে গেলে আফসানা খাতুন চৌকি থেকে নামে। বুকের ভার হালকা হচ্ছে।

সোহরাব আলি বলে, বুঝলে ওর কথা?

আমার সব বোঝা হয়ে গেছে গো। তুমি বোঝনি?

বুঝেছি। আমরা রিফিউজি আর ওরা সংখ্যালঘু। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এমন দুধরনের মানুষ তৈরি করেছে। মানুষের ভেতরে মানুষ।

কথা শেষ করে সোহরাব আলি গম্ভীর হয়ে যায়। একটু থেমে আবার বলে,

এদের কথাবার্তাই আলাদা নীরু। বহরমপুরের মতো নয়। ওখানে আমরা এমন আন্তরিক টঙে কথা বলতে শুনিনি।

আমিও না। তুমি তো তোমার বাগান আর চিকিৎসা নিয়ে ভালো থাকবে। আমি এদেরকে নিয়ে থাকব। যাক এই বাড়ির মতো মানুষের আশ্রয়ও পাওয়া গেল। আমার ভালোই লাগছে।

খুশি মনে দুজনে বারান্দায় আসে। লম্বা বারান্দার এক কোণে পিড়ি পেতে খেতে দিয়েছে ওদের। জাফর হাত নেড়ে মাকে বলে, ভীষণ ভালো রান্না হয়েছে মা। তোমার রান্নার মতো নয়। একদম আলাদা।

মারুফ ওর পিঠে চাপ্পড় দিয়ে বলে, নতুন রান্না তো সেজন্য মজা লাগছে। রোজ খেলে লাগবে না।

আহ্, এমন করে বলতে হয় না মারুফ। ভাললাকে ভালো বলতে শেখো।

সোহরাব আলি মৃদু ধমক দেয়। আর কেউ কথা বলে না। হারিকেনের আলোয় পাঁচজনে গোল হয়ে খেতে বসে। এই পাঁচদিনে কারোই তেমন খাওয়া হয়নি। সবাই ক্ষুধার্ত ছিল। তাছাড়া কি দুর্যোগ পার হয়ে এসেছে সবাই ভেবেছিল ভাত হয়তো গলা দিয়ে নামবে না। বিশেষ করে আফসানার নিজেরই এমন ধারণা ছিল। কিন্তু খেতে বসে রান্নার স্বাদ

খিদে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু দেখা গেল গলা বুঝি আর সরু কোনো পথ নয়, ওটা চওড়া হয়ে গেছে। ভাত নামছে তো নামছেই। অনায়াসে প্রচুর ভাত খেয়ে ফেলল।

খাওয়া শেষ করে মালতীর দিকে তাকিয়ে বলে, এমন রান্না আমি কখনো খাইনি মালতী। এমন রান্না রোজ খেলে আমি হাতি হয়ে যাব।

সোহরাব আলি মৃদু হেসে বলে, তোমার কিছুই হবে না। নীরু। ওদের পেয়ে আমরা দুঃখ ভোলার জায়গা পেয়েছি।

আফসানা মালতীর দিকে তাকায়। লাবণ্যভরা চেহারা। অভাবে কাবু হয়ে আছে শুধু।

কিরে মালতী তুই যে কিছু বলছিস না?

মালতী কথা বলে না। মৃদু হেসে মাথার ঘোমটা বাড়িয়ে দেয়। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লেপ্টে গেছে। আফসানা খাতুনের মনে হয় ওর কপাল জুড়ে সিদুরের মেঘ। নতুন জায়গার সবকিছু ওর ভালো লাগছে। এমন অনেক দৃশ্য ও দেখতে পাবে, যা দেখে ও বারবারই এ দেশে আসার কষ্ট ভুলবে। একদিন এ দেশকেও আপন করে নেবে। ওর ছেলেরাও আপন করে নিয়ে এ দেশের জন্য যা কিছু করার তার সবটুকু করবে। ওহ! আফসানা খাতুন বড় করে শ্বাস টানে। সবাই তার দিকে তাকায়, কিন্তু কেউ তাতে কোনো প্রশ্ন করে না।

জাফর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, হরেণ দাদা বলছিল আমাদের কোনো কষ্টই হবে না মা। এখানকার লোকজন সবাই খুব ভালো।

আফসানা খাতুন নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, সবাই কি কখনো ভালো হয় বাবা?

ঠিক বলেছো মা। সবাই ভালো হয় না। তবে মা বেশির ভাগ মানুষ। ভালো হয়। এই যেমন হরেণ দাদা, আর মালতী বৌদি আমরা কেমন লোক না জেনেই কত

ভালোবাসার আয়োজন করেছে। আমাদের দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে। বলছে, দেখে দেশটা তোমাদেরই হবে।

জাফরের কথা শুনে আফসানা খাতুন চোখের জল মোছে। হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বলে, আমাদের ভাগ্য যেন সব সময় এমন ভালোই থাকে রে আমার সোনার ছেলেরা।

আমাদের নিয়ে তোমার ভাবতে হবেনা। কি বললা বাবা? আমরা পারব ঠিকমতো দাঁড়াতে নিজেদের মতো করে অনেক বড় হতে?

জাফর খুশির স্বরে কথা বলে। সোহরাব আলি ঘাড় নেড়ে বলে, অনেক কঠিন কথা বলেছিস। আমাদের ছেলেরাই তো আমাদের আশা-ভরসা।

বাবা, বাবা!

দীপু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। বাবার চুলে নিজের মুখ ঘঁষে।

জাফর হাসতে হাসতে বলে, তোমার পাগলা ছেলে বাবা।

সবাই হাসে। মারুফ চুপচাপ, গম্ভীর। দীপু আর জাফরই হাসাহাসি, হৈচৈ করছে। ভালো লাগে ওদের এই প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস। নিজের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে আসার বেদনা ওরা কাটিয়ে উঠছে। ওরা আপন করে নিচ্ছে নতুন পরিবেশ। খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুটা নির্ভার মন নিয়ে। ঘুমোতে যায় আফসানা খাতুন। সোহরাব আলি বাগানের দিককার বারান্দায় এসে বসে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বুকে টানে। বাতাসে কামিনী ফুলের গন্ধ মেশানো। তাঁর ভালো লাগে। এই নতুন পরিবেশে নিজেকে উদ্বাস্তু মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে না অবাঞ্ছিত, এই ভাবনা সোহরাব আলিকে শক্তি যোগায়। তেমন শক্তি যাকে ভর করে একজন মানুষ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে নিজেকে নতুন করে নির্মাণ করে। একটু আগে রিফিউজি হয়ে যাওয়ার যে ভাবনা ওকে তাড়িত করেছিল সে ভাবনা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে। ভাবে, দেশের জন্য কিছু করাটাই হবে সবচেয়ে বড় ঋণ পরিশোধ। তাছাড়া নিজের সামাজিক সম্মানটাও বড় করে তুলতে পারবে এভাবে।

নিজের ভিটেমাটি থেকে চলে আসার অপমানও আর যন্ত্রণাদায়ক হবে না। সোহরাব আলি নিজের মুঠি দিয়ে চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে। যেন কোনো একটি শপথবাক্য উচ্চারণ করতে পারল এই মুহূর্তে।

রাস্তা দিয়ে দু-একটা রিকশা যাচ্ছে, টুংটুং বেল বাজে। দু-একজন মানুষের গলা শোনা যায়। ওরা হয়তো ঘরে ফিরছে। যেন কতকাল ধরে। ওদের একটি ঘর আছে এই শহরে। শহরটা ছোট। চারদিক খোলামেলা। যতটুকু দেখেছে তার মধ্যে এটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে সোহরাব আলি। মানুষের কণ্ঠস্বর ওর বুকের ভেতর ওম ছড়ায়। তবে মানুষই তো হাতে ছোড়া-দা নিয়ে তেড়ে আসে। আবার মানুষই মুখে ভাত তুলে দেয়। চোখের দৃষ্টিতে বলে, বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকার মতো জরুরি কাজ আর কি আছে? বেঁচে থাকলেই তো অনেক কিছু করার কথা ভাবা যায়। সোহরাব আলি চেয়ারে মাথা ঠেকিয়ে নিমগ্ন হয়ে শব্দ শোনেন। জাফর এসে কাছে দাঁড়ায়।

বাবা তুমি কি ভাবছো? ঘুমোবে না?

যাই। হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে। তবে মানুষের গলা শুনতে ভালো লাগছিল রে। মনে হচ্ছিল, আমি কান পেতে রই, আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে–

জাফর হেসে বলে, তুমি বেশ আছে। এতকিছুর পরও নিজের মতো করে ভাবতে পারছে।

সোহরাব আলি মৃদু হাসে।

তোমার কেমন লাগছে বাবা?

ভাবিনি এত আপন মনে হবে। আরো খারাপ কিছু ভেবে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল ভীষণ কঠিন হবে সবকিছু গুছিয়ে নিতে। এখন মনে হচ্ছে তেমন কিছু নয়। সব একরকম ঠিকই আছে।

আমারও এমন মনে হচ্ছে। মাকে নিয়ে ভয় ছিল। মাও বোধহয় অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে।

মারুফ সহজ হতে পারেনি।

হ্যাঁ। বাবা ভাইয়ার ব্যাপারটি তো একটু অন্যরকম। আঘাত পেয়েছে বেচারা, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে।

সোহরাব আলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাড়তে বলে, সময়ই ওকে ঠিক করে দেবে।

জাফর হেসে ওঠে।

আমাদের শেষ ভরসাই সময় বাবা। সময়ের ওপর ভরসা করেই আমরা অনেক কিছু ছেড়ে দেই। সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরাও অনেক ভারমুক্ত হই।

সোহরাব আলি কথা বলে না। হরণ আর মালতী কাছে আসে।

যাই বাবু?

এখনই যাবে?

আর কি? সব গুছিয়ে রেখে গেলাম। কাল সকালে এসে আবার দিনের কাজ শুরু করবো।

আচ্ছা যাও। আসলে কি জানো হরেণ তোমাদের ছেড়ে দিতে মন চায়। তোমরা কাছে থাকলে জোর পাই।

আমরা তো কাছেই থাকি। ডাবলই চলে আসব।

ওরা এ বাড়ির দেয়ালের বাইরে একটা টিনের চালায় থাকে। গরু আছে ওদের। দুধ বিক্রি করে সংসার চালায়। এ বাড়িতে যারা ছিল ওদের সঙ্গে হরেণের হৃদ্যতা ছিল। সেই সূত্রে এ বাড়ির দেখাশোনা করেছে ওরা। হরেণ আর মালতী দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। গাছ-গাছালির মাঝ দিয়ে চিকন রাস্তা ওদের জানা। মুহূর্তে ওরা কোথায় আড়াল হলো জাফর। দেখতে পায় না। অন্ধকার যেন ওদের কাছে টেনে নিল। যেন অন্ধকারই ওদের জীবনের আলো। জাফরের বেশ লাগে ভাবতে অন্ধকারেরও সজীবতা আছে। অন্ধকার ছাড়া জীবনের অর্থ ফুস করে এক হয়ে যায়। এরকম অর্থ তো কখনো হাজার ফুল ফোটায় না।

সোহরাব আলি, আবার চেয়ারে বসে পড়ে। রাস্তায় রিকশার টুংটাং ধ্বনি নেই। মানুষের কণ্ঠস্বরও ভেসে আসে না। জাফর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে,

বাবা উঠবে না?

তুমি ঘুমোও। আমি একটু পরে আসছি।

সকালে বাড়িটা ঘুরে দেখে মন জুড়িয়ে গেল সবার। শেষ পর্যন্ত সোহরাব আলির পুরো পরিবারকে মানসিক আশ্রয় দিল বাগান নামের এলোমেলো, অগোছালো, ফাটাফুটো একখণ্ড ভূমি। সবাই ভাবলো এ যাত্রায় ওরা বেঁচে গেল, ওদের আর ভয় নেই। পাকিস্তানের সীমান্তে ঢোকার পরও ওদের ভয় কাটেনি। সন্ত্রস্ত, তটস্থ, আতঙ্ক যেন পিঠে আমূল ছুরি বসিয়ে দেয়ার জন্য একটা উদ্যত হাত তাড়া করে ফিরছে। দেশভাগের মাসখানেকের মধ্যেই পালিয়ে আসতে হলো ওদের। একে দেশভাগ, তার ওপর বহরমপুরের অমন ছিমছাম তরুলতাময় বাড়ি ছেড়ে আসার বেদনার তীব্রতা ছিল প্রচণ্ড। সোহরাব আলি এখনো ভেবে পায় না বাড়ি বদলের দায়-দায়িত্ব দীপেন কাঁধে না নিলে সে কি করতে? এ ধরনের সমস্যার কথা ভাবলে মাথা ঝিম মেরে যায়। চিন্তা করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। রাতের আকাশের অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে ভেসে দেখল, এমন বোধ নিয়ে ও বড় হয়েছে। অসহায় হয়ে যাওয়াকে নিজের ভাগ্য মনে করে। মাঝে মাঝে শিশুর চাইতেও অসহায় হয়ে যায়। নিজের এই অক্ষমতা এত বছরেও কাটিয়ে

উঠতে পারল না। মনে মনে হেসে সোহরাব আলি। নিজেকেই বলে, আর কোনোদিনও পারবে না। এখন ছেলেদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে অনেক কিছু।

যার সঙ্গে বাড়ি বদল হলো আয়ুর্বেদিতে গভীর জ্ঞান ছিল তার। সেজন্যই এত বড় বাগান এবং এত গু আর ছোটবড় গাছ। ভদ্রলোক দীপেনের আত্মীয়। দীপেন চেনে সোহরাব আলিকে। তাই এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা পাকা করে ফেলে। খুব অনায়াসে সবকিছু হয়ে যায়। সোহরাব আলির বহরমপুরের বাড়ি ছিল একদম অন্যরকম। লতা দিয়ে এমন করে জড়ানো ছিল যে কোনো দেয়াল দেখা যেতো না। কেবল দরজা-জানালাগুলো খোলা ছিল। অপরিচিত কেউ ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো। কত যত্ন এবং পরিশ্রম করতে হয়েছিল ঐ লতাটার জন্য, ভাবলে বুক মুচড়ে ওঠে। কিন্তু সে ঠকেনি। দেশভাগের লাথিতে ছিটকে এসে এই বাগানে পড়েছে বলেই রক্ষে। নইলে এই ওলট-পালট জীবনযাপনে ক্ষুদ্র কীট হয়ে গিয়ে মানুষের মতো দিনযাপন হয়তো ভুলেই যেত। ভাবলেই শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। সোহরাব আলি কি জানে না এই সমাজে সত্যিকার মানুষের মতো বেঁচে থাকাই সবচেয়ে কঠিন। আবার নতুন উপাধি পেয়েছে রিফিউজি। হাঃ ওটা শরীরের চামড়ায় বাড়তি প্রলেপ। এ জীবনে আর মুছে ফেলতে পারবে না।

বহরমপুরের স্থানীয় হাইস্কুলের বোটানির মাস্টার ছিল সে। ছেলেদের বোঝাতে হার্ব মানে ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। যেমন গিমা, শিয়ালমুথা ইত্যাদি। স্রাব হলো অপেক্ষাকৃত বড় রকমের গাছ। যেমন গন্ধরাজ, হাস্নাহেনা, বেলী ইত্যাদি। ট্রি হলো বড় গাছ। যেমন–আম, জাম, সেগুন, কড়ই। কিন্তু নেশা ছিল বনৌষধির। টুকটাক ওষুধ বানিয়ে পাড়াপড়শির ছোটখাটো অসুখ সারাতো। শিক্ষকতার সঙ্গে নেশার যোগ ঘটিয়ে জীবনের চেহারা পাল্টে ফেলেছিল সোহরাব আলি। গায়ের লোকে ওকে বলতো মাস্টার-ডাক্তার। বড় আনন্দ পেত। আনন্দের মধ্যে ডুবে থেকে দুঃখ যে কি কখনো তা ভেবে দেখার সময়ই পায়নি। হায়রে, রাজনীতি! মানুষকে ঠেলে অন্য স্রোতে ফেলে দেয়। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে ধোপর কাঠের মতো জীবনের তক্তায় আছড়ায়।

পেছন ফিরে তাকায় সে। সেলে আসা দিনগুলোতে একদিন ঐ নেশা দ্বীপ হয়ে গেল। সোহরাব আলি অন্যসব যোগাযোগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। যখন যেখানে

নতুন গুল্মের সন্ধান পেয়েছে নাওয়া-খাওয়া তুলে তার পেছনে লেগে থেকেছে। গুল্মটিকে শেকড়সহ উপড়ে এনে মাটি ধুয়ে কাগজের মধ্যে রেখে কাঠের ভাঁজে চাপ দিয়ে শুকিয়ে নিয়েছে। তারপর বোর্ড পেপারের ওপর সুন্দর করে সুঁই সুতো দিয়ে গেঁথে দিয়েছে আফসানা খাতুন। স্বামীর এই কাজটি সে সবসময় হাসিমুখে করেছে। অনেক সময় সংসারের সব কাজ ফেলে রেখেও করেছে, একটুও বিরক্ত হয়নি। বরং তার কাছেও এটি এক চমৎকার আনন্দের কাজ ছিল। মনে। হতো যে কাজে সেটাই প্রার্থনা। তাই সেই কাজটিতে প্রার্থনার মতো মনোযোগ দিতে হয়। এমন বিষয় কেউ তাকে শেখায়নি। এটি তার নিজের ভেতর থেকে উঠে আসা শিক্ষা। নিজে নিজে শেখাটা অনেক মূল্যবান। সুঁইয়ের একেকটি ফোঁড় এই মূল্যবান কাজটিকে ওকে ঘোরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তখন সে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের সুতোটিও নতুন করে বুঝতে পারে। যেন নতুন একটি আবিষ্কার। এমন উপলব্ধির কথা সোহরাব আলিকে বললে সোহরাব আলি হো হো করে হাসে। হাসতে হাসতে আফসানা খাতুনের কপালের সামনে শুরু হওয়া সিঁথিতে চুমু দেয়।

এভাবেই জীবন—এভাবেই জীবনের ডালপালা গজায়—বসন্তে নতুন পাতা আসে—শীতে ঝরে যায়। সোহরাব আলি ছেলেদের বলে, তোদর মায়ের একটা ভালো গুণ এই যে সবসময় অন্যকে বোঝার চেষ্টা করে। এজন্যই আমার নেশা তার শরীরে অর্কিডের মতো প্রশ্রয় পায়। কোনো ধরনের হিসেবি চিন্তা সে নেশার গায়ে আঁচড় দেয় না। সোহরাব আলি মুখে নী স্বীকার করলেও মনে মনে বলে, আফসানা খাতুন গাছের মতো সহনশীল।

বোর্ডের ওপর গুল্ম গেঁথে সোহরাব আলির সামনে এনে রাখতো সে। দেখো তো পছন্দ হয় নাকি?

বাহ্ চমৎকার! তোমার মতো আর কে পারত! তুমি আমার কাজটাকে কাজের মতো কাজ করে দিয়েছে। আমি মরে গেলেও এগুলো থাকবে। আমার ছাত্রছাত্রীরা এগুলো দেখে শিখবে।

মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত আফসানা খাতুনের মুখ। চকচক করত দৃষ্টি—আর সেই মুহূর্তে দৃষ্টি সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে যেত। সোহরাব আলি বুঝে পেত যে জীবনটা শান্তিতে কেটে গেল। মানুষের জীবনে এর বেশি আর কিছু চাইবার নাই।

আফসানা খাতুনের তৈরি বোর্ডের এক কোণে লেবেল এঁটে সোহরাব আলি যত্ন করে লিখেছে গাছের বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্রের নাম, স্থানীয় নাম, হার্ব, স্রাব অথবা বড় গাছ। আরো লিখলো, যে এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার নাম, পরিবেশের বিবরণ, সংগ্রহের তারিখ ইত্যাদি। তাছাড়া নমুনা গাছের বিভিন্ন অংশের ছবি এঁকে সেই গাছের সার্বিক মাপ ও নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতো সেই বোর্ডে। এককথায় একটি সুন্দর হার্বেরিয়াম শিট। আলাদা একটি ঘরে সেগুলো যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছিল।

নির্দিষ্ট কাজের মাঝে কখনো দীপেন এসে ঢুকতো, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, সে সম্পর্কের অতিরিক্ত আরো কিছু ছিল তাদের মধ্যে। দীপেন হিসেবি এবং বুদ্ধিমান। সোহরাব আলি সরল, উদাসীন। তবু দুমেরুর দুজনের বন্ধুত্ব ছিল ঈর্ষণীয়। দীপেনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল গোনা। কোনো ধরনের নেশার প্রশ্রয় ছিল না তার কাছে। সোহরাব আলিকে খোঁচা দিত। অবশ্য খোঁচাটা বিদ্বেষের নয়, খুঁচিয়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য। বলতো, তোর এসব অকেজো নেশা আমি বুঝি না সোহরাব।

অকেজো কি রে? দেখিস এই করেই আমি একদিন একটা বিরাট হার্বেরিয়াম গড়ে তুলব।

তাতে হবেটা কি?

আমার আর হবে কি? মরার সময় সরকারকে দিয়ে যাব। জাতির উপকার হবে। এখানে গবেষণার কাজ হবে।

ও বাবা একেবারে অমর হওয়ার শখ!

দীপেন হো হো করে হাসে। সোহরাব আলি ব্রিত বোধ করে। লজ্জিত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে, অমরতার কথা আমি কখনো ভাবিনি দীপেন।

সোহরাব আলির মুখ দেখে দীপেনের মন হয় কথাটা বলা ঠিক হয়নি। প্রসঙ্গ নরম করে বলে, ভাবলে ক্ষতি নেই। কাজ তা ভালোই করছিস। তবে দেখিস এই করতে করতে নিজে আবার হাবেরিয়াম শিট হয়ে না যাস। কোনোদিন দেখব তো সারা শরীরে গুল্ম আঁটা।

সোহরাব আলি আবেগে দীপেনের হাত ধরেছিল, যত ঠাট্টাই করিস আশীর্বাদ কর তাই যেন হয়। আমার সাধনাই ঐ একটা। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস?

কথাটা বলে কিছুক্ষণ থমকে থাকে সোহরাব আলি। দীপেন ঘাড়ে হাত রেখে বলে, থেমে থাকলি যে? বল কি মনে হয়?

মনে হয় মরে যাওয়ার পরে আমার সারা শরীরে গুল্ম এঁটে আমাকে যদি কবরে পাঠানো হতো তাহলে আমি খুব খুশি হতাম।

যাহ, কি যে বলিস! দীপেন বন্ধুর হাত চেপে ধরে।

এ জন্যই তো চুপ করে ছিলাম। জানি এমন সাধ পূরণ হবে না।

এমন করে আর কখনো বলবি না।

দীপেন সাবধান করে দেয়।

না, বলব না। আমি জানি এটা বলার কথা না। তারপরও মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের কিছু প্রশ্রয় তো কারো কারো কাছে থাকে। তুই আমার সেই প্রশ্রয়ের জায়গা।

সোহরাব আলির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বোঝাই যায় এই একটা জায়গায় ও অকৃত্রিম। যা বিশ্বাস করে তা মনে প্রাণেই করে। হিসেবি দীপেনের এই বিশ্বাস ভালো লাগে। বলে, পাগল।

তারপর প্রাণখুলে হাসে।

তোর আগে যদি আমি মরে যাই দীপেন, তাহলে আমার এই জিনিসগুলো কিন্তু তুই রক্ষা করিস। দেখবি আমার যত্নে গড়া এই জিনিসগুলো যেন নষ্ট হয়ে না যায়। তাহলে মরেও শান্তি পাব না।

সোহরাব আলির চোখে পানি আসে।

কি পাগলামি। এখনই মরার কথা ভাবছিস কেন?

দীপেনের মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। দুজনেরই মনে হয়েছিল মৃত্যুটা বড় বেশি সত্য। দুজনেই বুঝি সে দরজায় পৌঁছে গেছে। দীপেন কোনো কথা না বলে সোহরাব আলির সামনে থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

কিন্তু ঘটনার টানাপাোড়েনে জীবন নিয়ে পালিয়ে আসার সময় কিছুই আনতে পারেনি ও। নিজের জীবন, স্ত্রী এবং তিন ছেলে ছিল তার সম্বল। কয়েকটা শিট গুছিয়ে বেঁধে ওর হাতে নিতে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল দীপেন। সোহরাব আলির গলায় ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দীপেনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল শুধু। স্পর্শ দিয়ে শেষ। কোনো কথা হয়নি। রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে বোঁচকা-বুঁচকির সঙ্গে সেই শিটগুলোও হারিয়ে যায়। দিশেহারা মানুষের দল, নতুন টানা সীমানা লাইনে কাঁটাতার, ঘুটঘুটে অন্ধকার, ফিসফাস কথা, সবকিছু বিমূঢ়, হতচকিত করে রেখেছিল ওকে। এখন এই মুহূর্তে অনুভব করছে, তার বুকের পাঁজরে একটা বিরাট ফুটো হয়েছে। সেটা আর বুঝবার নয়। আমনুরা স্টেশনে ট্রেনের জানালা দিয়ে ঢুকিয়েছিল দীপুকে। ভিতর থেকে টেনে নামিয়েছিল মারুফ। অনেকগুলো বস্তা ছিল সে কামরার ভিতর। কি ছিল ওরা জানতো না। ঐ বস্তার ওপর বসে রাত কাটিয়েছিল সোহরাব

আলি মারুফ আর জাফরকে নিয়ে। মেঝেতে চাদর বিছিয়ে বসতে দিয়েছিল। অফিসানা খাতুনকে। চারদিকে ধুলো, দুর্গন্ধ, ঠেলে বমি আসে। নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকা এক

রকম। ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে। এই দুঃসহ যন্ত্রণা কি নিদারুণ স্মৃতি হয়ে রইল। গতকাল দীপু প্রশ্ন করেছিল, আমরা। পালিয়ে এলাম কেন বাবা?

জানি না।

সোহরাব আলি মাথা নাড়ে। ছেলের কাছে কি মিথ্যে বললো? আসলেই কেন এই পলায়ন তা কি জানে ও? না কি জেনেও বুঝতে চাইছে না মন। মানে না বলে? দীপু কিছুক্ষণ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আপন। মনেই বলে, যাই বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করি গে। তুমি আমাকে অনেক কথাই বলতে চাও না বাবা।

দীপু চলে গেলে সোহরাব আলি নিজেকে বলে, এ তো পালিয়ে এসে জীবন বাঁচানো নয় সোহরাব, তোমার অস্তিত্বের বিলুপ্তি। আর কি হবে, এখন কোনো রকমে দিন গোন।

মাস দুই গড়িয়ে গেল। বাগানটা অযত্নে পড়ে থাকে। কোনো উৎসাহ নেই। আফসানা খাতুন বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিল। প্রবল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে। ফিরে যেতে চায় পুরনো বাড়িতে। স্মৃতি ছাড়া আর সামনের সবকিছু ধূসর। জ্বরের ঘোরে আফসানা খাতুন অনবরত বলে গেল ফেলে আসা দিনের কথা। অস্পষ্ট নয়, ভীষণ স্পষ্ট করে বলা। তখন তার চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা পরিবারের আর সবার চোখ ভিজে ওঠে। মাথায় জলপট্টি লাগাতে লাগাতে কখনো হাত থেমে যায় সোহরাব আলির। মনে হয় এই এতটা বছরের বয়সের দুঃখ সব এক জায়গায় এসে জমা হয়েছে। এই পাহাড় পেরুবে কি ভাবে?

সোহরাব আলি যেদিন বাগানটা ঘুরে দেখার জন্য নামল, দেখে শুনে চমকে উঠল একদম। এমন কতকগুলো গুল আছে যেগুলো সে আগে কোনোদিন দেখেনি। এই বাগান তার দৃষ্টিকে গভীর ও ব্যাপক করে দিল। ঘরে ফিরে আফসানা খাতুনকে ডেকে আনল।

দেখো নীরু, এই গুল্মগুলো আমি আগে কখনো দেখিনি।

সত্যি? তুমি হার্বেরিয়াম শিট তৈরি করো।

আবার? আবার নতুন করে সামনে যদি আবার একটি নতুন দেশ হয়? আবার যদি আমার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়?

আবার নতুন দেশ? কি যে বল না।

হতেও তো পারে। কে জানে সামনে কি আছে।

আফসানা খাতুন বিড়বিড় করে বলে, আবার যদি পালাতে হয়, তাহলে কোথায় পালাব আমরা? আমাদের তো পালানোর জায়গা নেই।

নেই বলো না নীরু। নতুন করে কী হবে আমরা জানি না। আমার মন বলছে আমাদের দেখার আরও কিছু বাকি রয়ে গেছে।

অতদিন আমরা বাঁচব না। নতুন করে কিছু হলে আমাদের ছেলেরা দেখবে।

হয়তো তাই হবে। কে জানে।

সোহরাব আলির কন্ঠ খাদে নেমে যায়। দৃষ্টিতে উদাসীন দিনের ছায়া। সে দৃষ্টি দূরের মাঠ পেরিয়ে হলুদ দালানে গিয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক থেকে সোহরাব আলি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আফসানা খাতুন নিজেও ব্রিত বোধ করে। যে উৎসাহে কথাটা বলেছে সে উৎসাহ দুজনের কারো বয়সে নেই। না, শুধু বয়স নয়, সেই সময়ও নেই। যে সময়টা ছিল পরিপূর্ণ, নিটোল, সে সময়ের অর্ধেকটা সীমান্তের কাঁটাতারে ছিঁড়ে আছে। ইচ্ছে করলেই জোড়া লাগানো যায় না। হঠাৎ করে সোহরাব আলি আফসানা খাতুনের মুখোমুখি হয়। স্ত্রীর ক্লান্ত, বিষন্ন চোখে চোখ রাখলে বুক কেঁপে ওঠে। তবু জোর করে বলে, তুমি না বলেছিলে নীরু চোখে ভালো দেখছো না। চশমা লাগবে?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখি। চোখে পানি আসে। সুঁই-সুতোর কাজ করলে চোখে ব্যথা হয়।

তাহলে তুমি কেমন করে বোর্ডের ওপর গুল্ম গাঁথবে? তোমার কষ্ট হবে।

তা আমি পারবো। চশমা নিলে অসুবিধা হবে না। আর যে কাজে আনন্দ পাই সে কাজে আবার কষ্ট কি! তুমি শুরু করো। আমি ঠিকই পারবো।

কিন্তু আমি পারবো না নীরু। নতুন করে শুরু করার সাধ্য আর আমার নেই।

সোহরাব আলির অসহায় কণ্ঠে আফসানা খাতুনের কষ্ট হয়। মানুষটা এমন ছিল না। নিজের নেশা নিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ সে নয়। একটা বিশাল ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ে গেছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্ধকার রাতে সীমান্ত অতিক্রম। শক্ত মুঠিতে পরস্পরের হাত ধরে রাখা। পাছে কেউ আলাদা হয়ে যায় কিংবা পিছিয়ে থাকে, অথবা হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো। কতটা পথ এভাবে হেঁটেছিল মনে পড়ে না। যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল তার মুখেও কথা ছিল না, ছিল সংকেত। একজন মানুষকে জীবনে বাঁচিয়ে দেয়ার জন্য ছোট্ট আলোর সংকেত। এখনো দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা। ভাবলে শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। অথচ এভাবে না এলে কচুকাটা হয়ে যেত। বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। কি নিদারুণ হয়ে উঠেছিল শেষের তিন চারটে দিন। শুধু দীপেন আগলে রেখেছিল। হিংস্র মানুষের সামনে দীপেনেরও জীবনের ঝুঁকি ছিল। কিন্তু সে ঝুঁকির তোয়াক্কা করেনি। কখনো রুখে দাঁড়িয়েছে, কখনো ওদের বুঝিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সবকিছু গুছিয়ে দিতে পেরেছে। নইলে কি যে হতো! সোহরাব আলি বিড়বিড়িয়ে বলে, আমি আর কিছু পারবো না নীরু। আমার পারার দিন শেষ। কেমন করে শুরু করতে হয় একদিন জেনেছিলাম, তেমন করে শেষ হয়ে যায় তাও দেখেছি। আর যে কটা দিন বেঁচে আছি, এভাবেই চলে যাক নীরু।

আফসানা খাতুন চমকে সোহরাব আলির দিকে তাকায়। তারপর বলে, ওগো চলো ঐ ছাতিম গাছটার নিচে বসি। কেমন থোকা থোকা সাদা ফুল হয়েছে।

হ্যাঁ নীরু, ভালো একটা গন্ধও আসছে। আমি এতক্ষণ খেয়ালই করিনি। তোমার অসুখের পর থেকে আমার মাথাটাও কেমন হয়ে থাকে।

দুজনে ছাতিমতলায় আসে। নুয়ে থাকা মাথা টেনে ধরে ফুলের গন্ধ শোকে। বারবার শুকে বুক ভরে শ্বাস টানে। তারপর ছেড়ে দেয়। দেখতে পায় ডালের মাথায় বসে আছে টুনটুনি—টুনটুন শব্দ করছে। ওহ, কি যে সুন্দর দেখতে!

আফসানা খাতুন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দেখো, দেখো।

শব্দ পেয়ে ফুড়ৎ করে উড়ে যায় টুনটুনি। ওটা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দুজনে তাকিয়ে থাকে।

তারপর হেঁটে যায় সামনে।

আফসানা খাতুন বলে, বহরমপুরে আমাদের বাগানটা আরো ছিমছাম ছিল। একদম ছবির মতো গোছানো। তুমি বাগানটার যত্ন করতে খুব। আমরাও হাত লাগাতাম। নইলে বাগান ছিমছাম রাখা কি সহজ কাজ।

সোহরাব আলি একটু আবেগতাড়িত হয়ে ওঠে, সে কথা ভুলে যাও। নীরু। এখন ছিমছাম কোনো কিছু আমার আর ভালো লাগে না। এই এলোমেলো ভাবটাই ভালো। আমার মনে হয় যে ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল, বাগান সাজানোয় তার মন ছিল কেবল গাছের বিস্তারে। সেই বেড়ে ওঠায় তিনি বোধহয় আনন্দ পেতেন নীরু। এখন থেকে আমিও ভাবছি সাজিয়ে গুছিয়ে বিন্যস্ত করলে কৃত্রিমতা বাড়ে। তার চেয়ে এই বুনো ভাব থাক। দেখছো না কেমন নতুন লাগছে। মনে হচ্ছে দিক ভুলে যেন কোনো দেশে এসেছি। সেটা অন্যের নয়, সেটা আমারই দেশ। চলো গাছেদের ঘরগেরস্থি দেখি।

সেই ভালো। এমনই থাক। এমন এলোমেলো। যেমন আমাদের দিনগুলো এলোমেলো হয়ে গেল এমন। আমরা আর কোনোকিছু সাজানোর কথা ভাবব না।

ঠিকই বলেছো। সোহরাব আলি আফসানা খাতুনের হাত ধরে।

ছাতিমতলায় বসবে মনে করলেও বসা হয় না। নতুন গাছ আর অচেনা স্পর্শ অনেকদিন দুজনের জীবনে বন্ধ ছিল। পালিয়ে আসার ষড়যন্ত্রে জীবনের দক্ষিণ দিকের দুয়োরটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বাগান আচমকা সে দুয়োর হাট করে খুলে দেয়। দুজনের হাঁটতে খুব ভালো লাগে। কাঁটায় আফসানা খাতুনের শাড়ি ছিঁড়ে যায়, সেদিকে খেয়াল নেই। ঝোপঝাপ পেরিয়ে হাঁটাটাই এ মুহূর্তে আনন্দের। সোহরাব আলি আকন্দের ফুল ভেঙে হাতে নিয়ে মৃদু হাসে।

তোমার খোঁপায় দেই নীরু।

কি যে বলো? বয়স হয়েছে না। চুল সাদা হয়ে গেছে। তাতে কি, বয়স তো আমারও হয়েছে। দুজনে একইভাবে এগুচ্ছি। এমন তো নয় যে একজনে বয়সটা চেপে ধরে থেমে গেছি। কাজেই আমার কাছে তোমার আবেদন একই রকম। শুধু খোঁপায় ফুল দেয়া কেন, আমি এখন ইচ্ছে করলে যা খুশি তা করতে পারি।

যা খুশি তা? আফসানা খাতুন চোখ কপালে তোলে।

একদম যা খুশি তা। তুমি কি তৃণশয্যা বোঝ—

উঃ একদম বক্তৃতা শুরু করলে।

তুমি তো বাধ্য করলে বক্তৃতা দিতে। আমারও খারাপ লাগছে যে খোঁপায় একটা ফুল পরাবার জন্য এত কথা বলতে হচ্ছে।

আফসানা খাতুন হেসে ফেলে।

সেটা তো তোমার দোষ। বয়সকালে তো জোর করে গুঁজে দিতে।

বয়সটা থাকলে কি আর এমন হেরে যেতাম।

ঠিক আছে দাও। দিয়ে বাহাদুরি নাও। শান্ত হও।

সোহরাব আলি আফসানা খাতুনের খোঁপায় ফুল গুঁজে দেয়। মাথায় আর ঘোমটা দেয়া হয় না ওর। লম্বা আঁচল পিঠে ঝোলে। দুজনে করমচা গাছটার কাছে এসে দাঁড়ালে আড়াল থেকে দীপু বেরিয়ে আসে। ফড়িং ধরায় ব্যস্ত ও।

কি করছিস রে? লুকিয়ে লুকিয়ে কি করছিস?

ফড়িং ধরছি মা। এ বাগানে না অনেক ফড়িং।

দেখিস হাতে পায়ে কাঁটা ফুটাস না যেন। ফড়িং ধরে আবার ছেড়ে দিচ্ছিস তো?

হ্যাঁ, মা দিচ্ছি। বাবা আমাকে কত্ত ছোটবেলায় শিখিয়েছিল ফড়িং ধরে পাখনা ছিড়তে হয় না।

লক্ষ্মী সোনা আমার।

ও মা তুমি খোঁপায় ফুল গুঁজেছো। ইস তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

দেখছো ছেলের কাণ্ড—

আফসানা খাতুন ফুল খুলতে যায়।

না, না খুলো না। তুমি রোজ খোঁপায় ফুল দিও মা। দীপু দুহাতে মায়ের হাত চেপে ধরে। বলে, বাবা দেখো মাকে পরীর মতো লাগছে। একদম ফুলপরী।

পাগল ছেলে, এখন কি আর পরী থাকতে পারি। বুড়ো হয়েছি না।

বুড়ো হলে কি হয়? ফুল দিতে নেই বুঝি? হারে দিতে নেই। ফুল তো তোদের মতো ছোটদের জন্যে।

মিথ্যে বলছো মা। ফুল কখনো ছোটদের জন্য না। ফুল বুড়োদের জন্যও।

দীপু আঙুল তুলে মাকে শাসায়।

তুই ঠিক বলছিস দীপু। ফুল সবার জন্য। তুই তোর মাকে রোজ ফুল তুলে দিস।

তাই দেবো বাবা। মাকে ফুলের মুকুট বানিয়ে দেবো। মাকে তখন রানীর মতো লাগবে।

দীপু আর দাঁড়ায় না। আরেকটা ফড়িঙের পেছনে ছুটে যায়।

আমার পেছনে লেগেছো কেন বলো তো? তোমার জ্বালায় পারি না, ছেলেও পেছনে লাগল।

সেই বয়সকালের মতো তোমার মাথায় ফুল দেখতে আবার আমার সাধ হচ্ছে নীরু।

সোহরাব আলির গভীর কণ্ঠে আফসানা খাতুন আর কথা বলতে পারে। বুকের ভেতরে নিজের আবেগও তোলপাড় করে ওঠে। ভালোবাসার দিনগুলোর স্মরণে বুক মুচড়ে ওঠে। যে সময়গুলো হারিয়ে যায় তা আর বাস্তবে ফেরে না কিন্তু সাধ হয়ে জ্বালায়। বুক ঝাঝিয়ে দেয়। বয়সকে নতুন করে পেতে বলে। এই যে দুজনে অনেক দিন পর একসঙ্গে হাঁটছে, আসলে কিছু না। তবু কেন মনে হচ্ছে অনেক কিছু—অনেক কিছু।

হঠাৎ করে আফসানা খাতুন আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বলে, দেখো, দেখো কি সুন্দর ফুল? কত ছোট একটা নাকফুলের মতো। অথচ রঙটা কি চমৎকার। যে উচ্ছ্বাসে কথা বলছিল সে উচ্ছ্বাস দপ করে নিভে যায়। এক মুহূর্ত সোহরাব আলির দিকে থমকে তাকিয়ে বই ও মা হাসছো যে?

তুমিও ছোটমানুষ হয়ে যাচ্ছো। উচ্ছ্বাসটা একদম দশ বছরের মেয়ের মতো।

তাই নাকি। এই আমি চললাম।

আফসানা খাতুন দ্রুতপায়ে হেঁটে আসে। সোহরাব আলি এক মুহূর্ত দেখে। তারপর পেছন থেকে ডাকে।

দাঁড়াও নীরু, আমাকে ফেলে যেও না। এখন একলা হাঁটতে আমার ভীষণ ভয় করে।

কেন? আফসানা খাতুন অবাক হয়ে তাকায়।

মনে হয় জনার্দন ভোজালিটা নিয়ে তাড়া করে আসছে। আমি দৌড়তে পারছি না। মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছি। আমার দম আটকে আসছে। নিশ্বাস নেয়ার মতো একটু বাতাসও কোথাও নেই।

আফসানা খাতুন ভয় এবং উদ্বেগে স্বামীর দুহাত চেপে ধরে বলে, ওগো এসব আর ভেবো না। বলো, আর কখনো ভাববে না। আমরা এমন ভাবলে, আমাদের ছোট দীপুকে আমরা মানুষ করতে পারব না। তুমি কি। চাও যে আমরা এসব কথা ভেবে আমাদের সংসার ছারখার করি?

আফসানা খাতুনের কণ্ঠে একরাশ ব্যাকুলতা ঝড়ে পড়ে।

ভাবতে তো চাই না। একলা হলেই এমন হয়। তুমি আর কখনো আমাকে একা রেখে আর কোথাও হেঁটে যেও না।

চলল, ঘরে যাই। আমার মনে হচ্ছে তোমার পিপাসা পেয়েছে। আমি তোমাকে লেবুর শরবত বানিয়ে দেব।

দুজনে হাঁটতে থাকে। আফসানা খাতুন মুঠিভরে তুলসি পাতা ছিঁড়ে গন্ধ শোঁকে। সোহরাব আলির খুব ইচ্ছে করে আফসানা খাতুনের হাতটা মুঠিতে নিয়ে হাঁটতে। তখুনি ঝোপের আড়াল থেকে দীপু বেরিয়ে আসে।

তোমরা এখনো বাগানে বেড়াচ্ছো? বুঝতে পারছি বাগানে বেড়াতে তোমাদের ভালো লাগছে। লাগবেই তো, আমারও ভালো লাগছে। বাগানটার মধ্যে ঘুরলে না বুননা মানুষের মতো লাগে নিজেকে। আজ তোমাকে ভীষণ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে বাবা।

তাই না কি রে?

হ্যাঁ বাবা তোমরা রোজ রোজ বাগানে বেড়াও না কেন? তাহলে তোমাদের একটুও মন খারাপ থাকবে নাদখবে, তোমরা যে বাগানটা ছেড়ে এসেছো তার কথা মনে করে আমাদের কান্না পাবে না। ভাববে এই বাগানটাও অনেক সুন্দর।

তোকে কে বলেছে যে আমাদের কান্না পায়? আমাদের মন খারাপ থাকে?

আমি বুঝি। মা সবসময় বাগানে আসে না বলেই তো মার মন খারাপ। থাকে। আর আমাকে বকে। আমাকে বকলে বুঝতে পারি যে মায়ের মন ভালো নেই। যে ছেলেটি মায়ের কাছে সোনার ছেলে তাকে বকলে তো মা নিজেই কষ্ট পায়।

তাই তো। তুই তো অনেক বুঝিস রে বাবা।

সোহরাব আলি হো হো করে হাসে।

আফসানা খাতুন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলে, আর তোকে বকবো না দীপু। দেখবি এখন থেকে আর আমি একটুও মন খারাপ করবো না।

ঠিক বলছো? মনে থাকবে তো?

একদম ঠিক। চল, ঘরে চল। আর ঘুরতে হবে না। রোদে তোর মুখ লাল হয়ে গেছে।

তোমরা যাও আমি আর একটু থাকি মা।

আহ্ দীপু সারাদিন কেবল খেলা!

কিন্তু দীপু ততক্ষণে হাওয়া। সোহরাব আলি আফসানা খাতুনের হাত নিজের মুঠিতে নেয়। আফসানা খাতুন প্রথমে অবাক হয়, তারপর হেসে ফেলে।

বাগান পেয়ে দীপুটার ভারি ফুর্তি হয়েছে।

আমারও। আফসানা খাতুন বলে। বাগান পেয়ে আমারও নতুন জীবন ফিরে এসেছে। নইলে যেই অবস্থায় এসেছি তাতে কি ঘাড় তুলে দাঁড়াবার সাধ্য ছিল।

এজন্যই আমরা পালিয়ে আসার দুঃখ অনেকটা ভুলতে পারছি নীরু। আমিও তোমার মতো বলতে চাই যে নতুন জীবন পেয়েছি। ঠিক।

আফসানা খাতুন প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বলে।

আমার মনে হয় বাগানে আমি সারা দিন কাটাই। তুমিও আমার পাশে ঐ ছাতিমতলায় বসে থাকো।

দুজনে একসঙ্গে সিড়িতে ওঠে। বারান্দা পেরিয়ে ঘর। আফসানা খাতুন রান্নাঘরে যায়। সোহরাব আলি নিজের ঘরে ঢোকে।

বয়সের ধাক্কা সামলিয়ে এবং মন খারাপ কাটিয়ে ওঠার পর সোহরাব আলি আস্তে আস্তে নিজের শক্তিতে ফিরে আসে। বুঝতে পারে ফিরে আসাটা নিয়ম। যে ফিরতে পারে না সময় তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। সোহরাব আলি তো তেমন মানুষ নয় যে

সময়ের কাছে হেরে যাবে। নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে এলোমেলো রেখার মাঝে সময়ের হিসাব করে সোহরাব আলি। নিজেকে বলে, এখনো অনেক সময় সামনে। হারব কেন? হারতে তো শিখিনি। যা শিখিনি সেটাই বা এই বয়সে এসে বড় হয়ে উঠবে কেন? ফেলে আসা জগন্টা ফিরে পাবার জন্য তৎপর হয় সে। চুপচাপ বসে থেকে অর্থহীন সময় কাটানো তার স্বভাবে নেই। বাগানে এলেই মনে হয় এই তার মাটি, এখানেই শেকড় চারানোর জায়গা। শেকড় গজালে অধিকার জন্মায়। মানুষের জীবনে অধিকার আদায় একটি বড় জিনিস। যে রাজনীতির জন্য আজ তার এই রিফিউজি হয়ে যাওয়া, সেই বোধকে নতুন শক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে সোহরাব আলি। পুরো পরিবারকে এমন বোধেই সাহসী করে তুলতে হবে। নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন ভাববে কেন? ইচ্ছে করলে কিছু একটা গড়তে পারে। অধিকার নিয়ে না এগুলে কেউ সেটা হাতে তুলে দেয় না। সোহরাব আলির মনে হয় এখন আবার নতুন করে দিন গোনার সময়। নতুন করে শুরু করতে হবে এবং তা এখনই। সময় নষ্ট করার সময় নেই।

শুরু হয় নতুন উদ্যমে কাজ। বাগানের নানা ধরনের গুল্ম-লতাপাতা ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখে কয়েকদিন। দেখে বুঝতে পারে এই বাগান যার ছিল সে হয়তো নিজে আয়ুর্বেদী চিকিৎসক ছিল। এখানকার বেশিরভাগ উদ্ভিদই ঔষধি গুল্ম। সোহরাব আলি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তাকে চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। নিজে তো ওষুধ বানাতে জানে। আফসানা খাতুন সহযোগিতা করবে। হরেণ-মালতীর সাহায্য নেবে। অল্প দিনেই নিজের জায়গা তৈরি করতে পারবে, এই আত্মবিশ্বাস সোহরাব আলিকে সবল করে তোলে। বুঝতে পারে হার্ট জাতীয় গুল্মের দিকেই তার আকর্ষণ প্রবল হয়েছে। সোহরাব আলি তা দিয়ে ওষুধ বানায়।

সে ওষুধে কেউ ভালো হয়ে গেলে নিজের উপর আস্থা দ্বিগুণ হয়। নতুন উদ্যমে আবার অন্য পরীক্ষায় যায়। হরেণ আর মালতী নানা ধরনের রোগী নিয়ে আসে। বুড়োরা যেমন আসে, তেমনি শিশুরাও। আগে আশেপাশের লোকজনকে ডেকে ওষুধ দিতো। এখন আর ডাকতে হয় না। একজন দুজন রোজই আসে। কোনোদিন বেশিও আসে। লোকে উপকার পাচ্ছে। সোহরাব আলির এখন আর হার্বেরিয়াম গড়ে তোলার স্বপ্ন নেই। ভাবে, দূর ভবিষ্যতের চিন্তা এখন আর করা যাবে না। এখন ভাবতে হবে

বর্তমানের কথা ভাবতে হবে মানুষের সুস্থ থাকার কথা। এখানকার মানুষের জন্য চিকিৎসাব্যবস্থা তেমন নেই। বেশিরভাগ লোকই নানা অসুখে ভোগে। ভুগতে ভুগতে কখনো আপন নিয়মে ভালো হয়, নয়তো আর। ভালো হয়ে ওঠা হয় না। মৃত্যুর দিন গোনে। সোহরাব আলির মনে হয় যন্ত্র দিয়ে চিকিৎসা দেয়াই হবে তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এভাবেই মানুষের কাছে যাওয়া যায়। ওদের সুখ-দুঃখের অংশী হওয়া যায়। এ মন্দ নতুন যাত্রা নয়। নিজের ওপরই নিজের আস্থা জন্মায়। মাঝে মাঝে আফসানা খাতুনও বলে, খুব একটা উপকারের কাজে হাত দিয়েছে। মানুষ তোমাকে দোয়া করবে। আগে তো মেয়েরা ওষুধের জন্য আসত না। এখন দেখি ওরাও আসতে শুরু করেছে গো।

তুমি খুশি হয়েছে নীরু?

হ্যাঁ, ভীষণ খুশি হয়েছি। এমন করে শান্তিতে বাস করতে পারবো আমি ভাবতে পারিনি।

সোহরাব আলি গভীর ভালোবাসায় জীবনসঙ্গিনীর দিকে তাকায়। বলে, রোগীদের সঙ্গে কথা বললে বুকের ভার হালকা হয়। ওরা অনায়াসে নিজের সুখ-দুখের কথা গড়গড়িয়ে বলে যায়। এদের কোনো সংকোচ নেই। ওরা। আমাকে খুব আপন ভাবে গো।

আল্লাহ, তোমার ভালো করুক। আমরা যেন সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারি। আমাদের ছেলেরা যেন মানুষের মতো মানুষ হয়।

আফসানা খাতুন আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে।

সোহরাব আলি নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। বলে, নীরু লোকগুলো কি ভীষণ সরল! বহরমপুরের লোকেরা এমন ছিল না। ওদের মাঝখানে একটা আড়াল ছিল। ওরা কাছে এলেও দুরত্ব রাখতো। কিন্তু এখানকার লোকদের ঐ সবের বালাই নেই। যাকে বিশ্বাস করে তাকে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। নিজের ঘরে খাবার না থাকলেও একটা লাউ কিংবা এক জগ দুধ জোর করে দিয়ে যায়। নিতে না চাইলে মুখ কালো করে। সে তো আমি দেখতে পাচ্ছি। ওদের দেয়া জিনিস দিয়ে তরকারি রধিলে সেদিন দীপু ভীষণ খুশি হয়। ও

ঠিকই বুঝতে পারে যে কোনটা সরাসরি গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা তরকারি, আর কোনটা বাজার থেকে কেনা।

দুজনে আবার দুজনের কাজে চলে যায়। এভাবে দুজনের নতুন জগৎ গড়ে উঠতে থাকে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ এক জীবনের সঞ্চয় পূর্ণ করে দেয়। সোহরাব আলি প্রায়ই ভাবে, এটুকু করে যেতে পারলেই শান্তি। এই জীবনে তার আর কিছু চাওয়ার নেই। এ দেশের মানুষ সোহরাব আলির জন্য ভিন্ন অভিজ্ঞতা। কেউ ভালো হয়ে গেলে যখন এসে বলে, ডাক্তার সাব, শরীরে আর রোগবালাই নাই। একদম ভালো হয়ে গেছি। ডাক্তার সাব আল্লাহ আপনাকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখুক। আল্লাহই তো আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে।

তখন কেমন বিস্ময় লাগে। মানুষের এমন অনুভব তাকে হতবাক করে দেয়। সোহরাব চট করে কিছু বলতে পারে না। ঘন ঘন মাথা নাড়ায় শুধু। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, তুমি আমাকে কোথায় তুলেছো তুমি জানো না কুদ্দস। আমার মনে হয় আমার মাথা আকাশ ছুঁয়েছে। ওহ, কুদ্দস আমার বুকের ভেতর আনন্দের সমুদ্র ঢুকে গেছে। ওখানে শুধুই জোয়ার, জোয়ার।

ডাক্তার সাব, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

না তো, আমি তো ভালোই আছি।

আল্লাহ যেন আপনাকে ভালো রাখেন। ডাক্তার সাব, আপনি ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকব। যাই। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

যাই।

চলে যায় কুদ্দুস। সামনে এসে বসে ঘোমটা মাথায় একজন নারী। মৃদু কণ্ঠে বলে, ডাক্তার সাব!

সোহরাব চমকে তাকায়। এদের কাছে সে কত অনায়াসে একজন ডাক্তার হয়ে গেছে। এদের কত নির্ভরতা তার ওপর। রোগীদের নাম ঠিকানা অসুখের বিবরণ লেখার খাতার পাতা উল্টিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম কি মা?

হালিমা খাতুন।

বয়স কত?

হালিমা খাতুন প্রথমে বলে, জানি না। তারপর একটু চিন্তা করে বলে, লেখেন পঞ্চাশ।

পঞ্চাশ বোধ হয় না। আরও কম হবে।

তারপর মুখ উজ্জ্বল করে বলে, দুনিয়াজুড়ে যে একটা যুদ্ধ লাগছিল তারও অনেক বছর আগে আমার জন্ম।

সোহরাব আলি বুঝতে পারে যে, হালিমা খাতুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছে। তারপর নিজে অনুমান করে একচল্লিশ বছর লেখে।

কি হয়েছে মা আপনার?

খুসখুসে কাশি আর জ্বর।

জিভ দেখান।

শুরু হয় নানা কথা। শেষ পর্যন্ত তা ছেলেমেয়ে, উপার্জন, এমনকি জায়গা জমিন পর্যন্ত গড়ায়। সোহরাব আলির বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য তার জীবনযাপনের পরিবেশ, মানসিক ক্ষতি ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। অসুখ কোনো একক বিষয় নয়, অসুখ বহুর সমন্বয়। তাই যতটা সম্ভব একজন রোগীর নানা কিছু জানার চেষ্টা করে।

এক ফাঁকে হালিমা খাতুন জিজ্ঞেস করে, আমি ভালো হবে তো ডাক্তার সাব?

ভালো-মন্দ রাখার মালিক আল্লাহ। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করি।

ঠিকই বলেছেন ডাক্তার সাব।

হালিমা খাতুন মাথার ঘোমটা টেনে সোজা হয়ে বসে। সোহরাব আলি মনোযোগ দিয়ে অসুখের ধরন বোঝার চেষ্টা করে। ওষুধ নির্ধারণ করে। বুঝতে পারে এদের জন্য কিছু করার চেষ্টায় তার মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। এটাকে নিজের সাধনাও মনে করে সে। নিজেকে বলে, সাধনা না করলে। সিদ্ধি আসে না। সিদ্ধি লাভই তো সাধনার শেষ কথা। কারো জ্বর কমে যাওয়া, আমাশয় ভালো হওয়া, শশাথের উপশম হওয়া এখন সোহরাব আলির জন্য দারুণ আনন্দের। গভীর প্রশান্তি তার রাতের ঘুম নিবিড় করে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখনো বিড়বিড় করে, নিমপাতার পানিতে ভালো করে পাঁচড়াগুলো ধুয়ে নেবে। তারপর এই কাঁচা হলুদ বাটা লাগিয়ে দেবে। দেখবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তোমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে আক্কাস। যাও, এখন বাড়ি যাও। না, আর আসতে হবে না।